গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতি: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

ড. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া*

Abstract

In a research, informed consent is the means of reciprocal relationship between a research subject and researcher that results in the research's subject agreement to undergo a specific participation of research intervention. For moral reasons, a research subject must be given adequate information to be fully informed before deciding to do undergo a research which should also be recorded in writing form. The significance of informed consent gradually exercised in the field of procedures, research and health care because of its moral and legal gesture. This article focuses some common nature of informed consent in general and it also shows the suitability of ethical practices and assesses the practice of informed consent in research. To find out an idea about the knowledge, attitude and practices-pattern of informed consent in the field of research, this survey was conducted in January 2015 to December 2016. Among the researchers of social science, biological science and medical sciences, only one hundred twenty participants selected randomly from the researchers of postgraduate level. A set of structured questionnaire arrayed and supplied to the participants to know their knowledge, attitude and practice about informed consent. Through this study, the present article concludes that most of the researchers are not much knowledgeable about informed consent, even many of them have no primary knowledge to apply informed consent in practice.

ভূমিকা

গবেষণা, রাষ্ট্রীয় পলিসি প্রণয়ন ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। গবেষণা ও

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

চিকিৎসা ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়টি খুবই সূক্ষ্ম, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে অনেক সময় বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। কোন কাজটি রেখে কোনটি করতে হবে তাও এই বিরোধের কারণ। আবার মন্দের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভালো কাজটি কি হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণও একটি জটিল বিষয়। সংকটাপন্ন ও উভমুখী অবস্থায় একজন ব্যক্তি কীভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন? চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসক রোগীকে কী ধরনের চিকিৎসা সেবা দিতে পারবেন? একজন গবেষক তাঁর গবেষণায় অংশগ্রহণকারীকে কীভাবে বিবেচনা করবেন? বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতি পরিহার করার জন্য গবেষণায় অংশগ্রহণকারীকে গবেষণা সম্পর্কে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়াদি সম্পর্কে বিবেচনায় রাখতে হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট গবেষণা বিষয়ের তথ্যাদি অবগত করার ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীর সম্মতির প্রয়োজন রয়েছে। অবহিত তথ্যাদির আলোকে একজন অংশগ্রহণকারী তাঁর সম্মতি বা অসম্মতি জানাবেন। ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে তিনি গবেষণায় অংশগ্রহণ করবেন কিনা তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার। তবে গবেষক অংশগ্রহণকারীর উপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারবেন না। বরং অংশগ্রহণকারী যেন পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে সেজন্য প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পে কী ধরনের লাভ/ক্ষতি রয়েছে সে সম্পর্কেও তথ্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। অংশগ্রহণকারী স্বাধীন, তিনি স্বতঃপ্রণোদিত ও স্ব-শাসনের আলোকে সম্মতি জানাবেন। কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ অথবা প্রভাব বা প্রলোভন খাটিয়ে এ সম্মতি আদায় করা যাবে না। গবেষক ও অংশগ্রহণকারীর মধ্যে এ বোঝাপড়াই হলো অবগতিক্রমে সম্মতির মূলকথা। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশ বাস্তবতায় অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি গবেষক ও অংশগ্রহণকারীর জ্ঞান ও মনোভাব সম্পর্কে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। আলোচনার ধারবাহিকতায় প্রথমে জানার চেষ্টা করেছি অবগতিক্রমে সম্মতি কী? বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা গবেষণায় কি অবগতিক্রমে সম্মতির রীতি অনুসরণ করা হয়? উপর্যুক্ত শেষতক প্রশ্ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবার জন্য প্রশ্ন-সাক্ষাৎকারের (Questionnaire) ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

অবগতিক্রমে সম্মতি কী?

চিকিৎসা ব্যবস্থা, গবেষণা ও নতুন আবিস্কৃত ঔষধ ও জেনেটিক ফুডের ট্রায়ালের পূর্বশর্ত হিসেবে অবগতিক্রমে সম্মতিকে অনুশীলন প্রয়োজন। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সম্পৃক্ত থাকে, তাদেরকে গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। গবেষণা বা ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারীর দায়িত্ব কী হবে? ট্রায়ালের পরীক্ষামূলক দিক থেকে অংশগ্রহণকারীর কী ধরনের ঝুঁকি বা অসুবিধার মুখোমুখি হতে পারে সে সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ থাকতে হবে। বোধগম্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিবরণ সংবলিত চুক্তিপত্রই অবগতিক্রমে সম্মতি। এখানে স্পষ্টতঃ উল্লেখ থাকতে হবে যে, স্বেচ্ছাসেবী মানসিকতা থেকে অংশগ্রহণকারী গবেষণায় অংশগ্রহণ করবেন। তবে অংশগ্রহণকারী ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে গবেষণা থেকে নিজেকে সরিয়েও নিতে পারেন। কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ বা প্রভাব খাটিয়ে কাউকে গবেষণায় সম্পৃক্ত রাখা যাবে না। অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে যে সব তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় তার গোপনীয়তা রক্ষাও অবগতিক্রমে সম্মতির মূল লক্ষ্য। সংশ্লিষ্ট গবেষণা বা ট্রায়ালে যদি নতুন কোন তথ্য থাকে তাহলে অংশগ্রহণকারীকে তা অবহিত করতে হবে। তা জেনে অংশগ্রহণকারী কাজটি চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক কিনা সে সম্পর্কেও তার মতামত স্পষ্ট করতে হবে।

সাম্প্রতিককালে গবেষণাকে নৈতিক মানদন্ডের আলোকে সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেক গবেষণা

প্রতিষ্ঠানে ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ড রয়েছে। রিভিউ বোর্ড-এর কাজ হলো গবেষণার নৈতিক দিকসমূহ মূল্যায়ন করা। নৈতিক মূল্যায়নের প্রাথমিক শর্ত হলো গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির বাস্তবায়ন। আন্তর্জাতিক সংস্থা World Health Organasiation (WHO) এর ইথিক্যাল গাইডলাইনে অবগতিক্রমে সম্মতির সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতি ব্যক্তির স্ব-শাসন রক্ষা করতে সাহায্য করবে। মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তি স্ব-ইচ্ছায় যদি কোনো গবেষণায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তাকে অবশ্যই গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে। প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি উপস্থাপন করতে হবে সহজ ও সরলভাবে । এর আরেকটি শর্ত হলো— কোনো প্রকার চাপ, বাহ্যিক প্রভাব ও প্রণোদনা, হুমকি ও প্রলোভন ছাড়াই অংশগ্রহণকারীকে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ দিতে হবে।

গবেষণার ক্ষেত্রে অবগতিক্রমে সম্মতির প্রাথমিক লক্ষ্য হলো গবেষণা-সাবজেক্টের স্বার্থ সংরক্ষণ, কল্যাণ সাধন ও স্ব-শাসনের উন্নয়নকে সংরক্ষণ করা। অনেক সময় এসব লক্ষ্যসমূহ তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দিক থেকে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারে। এমনও হতে পারে যে, তত্ত্ব যা দাবি করছে বাস্তবতার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। এ ধরনের দ্বন্দ্ব উদ্ভূত হবার কারণ হলো সাবজেক্টের কল্যাণ ও মূল্যকে সংজ্ঞায়িত করার প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে। প্রায়শই লক্ষ করা যায়— সাবজেক্টের কল্যাণ সাধন ও স্ব-শাসন উন্নয়নের প্রশ্নে প্যাটারনালিজম ও স্ব-শাসনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে থাকে। এই বিরোধ নিরসনের উপায় হিসেবেই প্রয়োজন দ্বন্দ্বের পরিধি ও স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। এই অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে সম্ভব পারস্পরিক সংহতি ও সমন্বয় সাধন করা। গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির অনুশীলনের বিষয়টিও এখানে রয়েছে। অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে গবেষক সত্যবাদিতার পরিচয় দিবেন, গবেষণার স্বার্থে অংশগ্রহণকারীর মতামতকে গুরুত্ব দিবেন, তার স্ব-শাসন ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান দেখাবেন। অংশগ্রহণকারীর সম্মান ও মঙ্গলের কথা ভাবলেও এ দ্বন্দ্ব নিরসন করা সম্ভব।

নীতি সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, অবগতিক্রমে সম্মতি হলো— রিসার্চ-সাবজেক্টের স্ব-শাসন নিশ্চিত করা। এতে করে সাবজেক্ট কখনোই প্রতারণার শিকার হবেন না, সেবা পাবার জন্য সময়ক্ষেপণ করতে হবে না। এমনকি চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসক, গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক স্বাধীনভাবে আত্ম-অনুসন্ধান চালাতে পারবেন। একইভাবে রোগী ও রিসার্চ-সাবজেক্ট উভয়েই এই আত্ম-অনুসন্ধান চালাতে পারবেন। এর মধ্য দিয়ে রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের, কিংবা গবেষকের সঙ্গে গবেষণা-সাবজেক্টের পেশাগত প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি হবে। এই প্রতিশ্রুতি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে, নিজেদেরকে স্বেচ্ছাসেবী মানসিকতার জায়গায় থেকে সম্পৃক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির লক্ষ্য হলো— গবেষণা-সাবজেক্টের প্রতি অবদমন, জোরজবরদস্তি ও প্রলোভন দেখিয়ে গবেষণায় অংশগ্রহণ করানোর প্রবণতাকে প্রতিরোধ করা। অন্যদিকে এটি গবেষক ও সাবজেক্ট-এর সম্পর্ক উন্নয়নেও সাহায্য করে থাকে। গবেষণায় যাদেরকে সাবজেক্ট হিসেবে নির্বাচন করা হয় তাদের স্বাধীনতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, গবেষণায় অংশগ্রহণ করবে কি করবে না, অথবা গবেষণা বা ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করার ফলে তার স্বাস্থ্য ও মানসিক ঝুঁকি আছে কিনা এসব বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা খুবই প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তাই অবগতিক্রমে সম্মতির শর্ত পূরণে সাহায্য করে থাকে।

গবেষণায় কেন অবগতিক্রমে সম্মতি?

প্রশ্ন হতে পারে গবেষণায় কেন অবগতিক্রমে সম্মতির প্রয়োজন? এ প্রশ্নের সঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন জড়িত, গবেষণায় কখন থেকে অবগতিক্রমে সম্মতির অনুশীলন শুরু হয়েছে? একটা সময় ছিল যখন গবেষণা কিংবা চিকিৎসায় উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব (Hard Paternailism) নীতির অনুসরণ করা হতো। এই নীতি অনুসারে, গবেষকই নির্ধারণ করবেন গবেষণায় কী হবে, কিংবা কী হবে না। এখানে গবেষকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, অংশগ্রহণকারী হলো নিমিত্ত মাত্র। কঠোর পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্বের কয়েকটি আমূল দৃষ্টান্ত হলো: নাজি চিকিৎসা গবেষণা, আমেরিকার হপকিন্স মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেনেরিট্টা লেকস সেল গবেষণা ও টাসকিগি ইনস্টিটিউট পরিচালিত বর্ণ-আফ্রিকান আমেরিকানদের ওপর সিফিলিস গবেষণা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধবন্দী ইহুদিদের ওপর নাজি গবেষকদের পরিচালিত গবেষণা নৈতিক ব্যত্যয়ের একটি ভয়ংকর দৃষ্টান্ত। চোখের বর্ণের ভিন্নতা অনুসন্ধানের জন্য চৌদ্দ জোড়া যমজ শিশুর ওপর দীর্ঘ মেয়াদি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণা চলাকালীন সময়ে শিশুদের মৃত্যু হয়। যুদ্ধ-বন্দী ইহুদি নারীদের ওপর প্রফেসর কার্ল ক্লবার্গ এর জন্ম-উৎপাদক (Reproductive Medicine) ঔষধের ট্রায়াল আরেকটি দৃষ্টান্ত। নন-সার্জিকেল স্টেরিলাইজেশন কৌশলে ক্লবার্গ আবিষ্কৃত ঔষধ ইহুদি বন্দী নারীদের ওভারিতে প্রবেশ করানো হতো। এ ঔষধসমূহ এতোটা রাসায়নিক উপাদান যুক্ত যা ওভারিতে প্রবেশের কিছুক্ষণের মধ্যে মারাত্মকভাবে ওভারি ফোলে যেত। কিছু দিনের মধ্যে ঐসব নারীর ফ্যালোপিয়ান টিউব ফেটে বন্ধ হয়ে যেতো, যা অবধারিত মৃত্যুর কারণ ছিলো। ক্লবার্গের ট্রায়ালে অংশগ্রহণকৃত অসংখ্য নারীর মৃত্যু হয় এভাবে।

হেনেরিট্টা লেকস সেল (HeLa Cell) আবিষ্কারও অনৈতিক গবেষণার দৃষ্টান্ত। পাঁচের দশকে এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয় আমেরিকার জন হপসকিন হাসপাতাল। হেনেরিট্টা লেকস আফ্রিকান-আমেরিকান একজন দরিদ্র তামাক চাষী। তিনি সার্ভিকেল ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে উক্ত হাসাপাতালে ভর্তি হন। হপ্সকিনস হাসপাতালের হেনরিট্টা লেকসের চিকিৎসক হাওয়ার্ড জোনস ও গবেষক জর্জ গে আবিষ্কার করেন হিলা কোষ । হেনেরিট্টার অনুমতি ছাড়াই তার সার্ভিক্স থেকে এ কোষটি সংগ্রহ করে গবেষণায় কাজে লাগানো হয়। এই কোষ বার বার বিভাজিত হয়ে নতুন কোষ সৃষ্টি করতে সক্ষম । কার্যত কোষটি হলো মৃত্যুহীন। মৃত্যুহীন এই কোষটি পোলিও, ক্যান্সার চিকিৎসা ও HPV vaccine তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। মিসেস লেকের সার্ভিক্স সেল নেওয়া হয়েছিলো তার অনুমতি ছাড়াই। তা ছিল মিসেস লেকস-এর পরিবারের প্রতি এক ধরনের অন্যায্যতা। নৈতিকতা বহির্ভূত গবেষণার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো আমেরিকার টাসকিগি ইনস্টিটিউট পরিচালিত "সিফিলিস পরীক্ষা" । আফ্রিকান-আমেরিকান প্রায় ৬০০ পুরুষের উপর গবেষণাটি চালানো হয়। অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ৩৯৯ জন সিফিলিস রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাদেরকে বিনামূল্যে মেডিকেল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও খাবার সরবরাহের সুযোগ দেওয়া হয়েছিলো। এমনকি মৃত্যুর পর তাদের সৎকার করার ফ্রি ইনসুরেন্স সুবিধাও রাখা হয়েছিলো। তাদেরকে বলা হয়েছিলো "তাদের শরীরে মন্দ রক্ত রয়েছে"[১] বিধায় তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন।

[১] সিফিলিস আক্রান্ত রোগীদের এই নামে অভিহিত করা হয়

প্রতিষ্ঠানে ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ড রয়েছে। রিভিউ বোর্ড-এর কাজ হলো গবেষণার নৈতিক দিকসমূহ মূল্যায়ন করা। নৈতিক মূল্যায়নের প্রাথমিক শর্ত হলো গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির বাস্তবায়ন। আন্তর্জাতিক সংস্থা World Health Organasiation (WHO) এর ইথিক্যাল গাইডলাইনে অবগতিক্রমে সম্মতির সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতি ব্যক্তির স্ব-শাসন রক্ষা করতে সাহায্য করবে। মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তি স্ব-ইচ্ছায় যদি কোনো গবেষণায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তাকে অবশ্যই গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে। প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি উপস্থাপন করতে হবে সহজ ও সরলভাবে । এর আরেকটি শর্ত হলো— কোনো প্রকার চাপ, বাহ্যিক প্রভাব ও প্রণোদনা, হুমকি ও প্রলোভন ছাড়াই অংশগ্রহণকারীকে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ দিতে হবে।

গবেষণার ক্ষেত্রে অবগতিক্রমে সম্মতির প্রাথমিক লক্ষ্য হলো গবেষণা-সাবজেক্টের স্বার্থ সংরক্ষণ, কল্যাণ সাধন ও স্ব-শাসনের উন্নয়নকে সংরক্ষণ করা। অনেক সময় এসব লক্ষ্যসমূহ তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দিক থেকে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারে। এমনও হতে পারে যে, তত্ত্ব যা দাবি করছে বাস্তবতার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। এ ধরনের দ্বন্দ্ব উদ্ভূত হবার কারণ হলো সাবজেক্টের কল্যাণ ও মূল্যকে সংজ্ঞায়িত করার প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে। প্রায়শই লক্ষ করা যায়— সাবজেক্টের কল্যাণ সাধন ও স্ব-শাসন উন্নয়নের প্রশ্নে প্যাটারনালিজম ও স্ব-শাসনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে থাকে। এই বিরোধ নিরসনের উপায় হিসেবেই প্রয়োজন দ্বন্দ্বের পরিধি ও স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। এই অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে সম্ভব পারস্পরিক সংহতি ও সমন্বয় সাধন করা। গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির অনুশীলনের বিষয়টিও এখানে রয়েছে। অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে গবেষক সত্যবাদিতার পরিচয় দিবেন, গবেষণার স্বার্থে অংশগ্রহণকারীর মতামতকে গুরুত্ব দিবেন, তার স্ব-শাসন ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান দেখাবেন। অংশগ্রহণকারীর সম্মান ও মঙ্গলের কথা ভাবলেও এ দ্বন্দ্ব নিরসন করা সম্ভব।

নীতি সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, অবগতিক্রমে সম্মতি হলো— রিসার্চ-সাবজেক্টের স্ব-শাসন নিশ্চিত করা। এতে করে সাবজেক্ট কখনোই প্রতারণার শিকার হবেন না, সেবা পাবার জন্য সময়ক্ষেপণ করতে হবে না। এমনকি চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসক, গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক স্বাধীনভাবে আত্ম-অনুসন্ধান চালাতে পারবেন। একইভাবে রোগী ও রিসার্চ-সাবজেক্ট উভয়েই এই আত্ম-অনুসন্ধান চালাতে পারবেন। এর মধ্য দিয়ে রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের, কিংবা গবেষকের সঙ্গে গবেষণা-সাবজেক্টের পেশাগত প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি হবে। এই প্রতিশ্রুতি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে, নিজেদেরকে স্বেচ্ছাসেবী মানসিকতার জায়গায় থেকে সম্পৃক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির লক্ষ্য হলো— গবেষণা-সাবজেক্টের প্রতি অবদমন, জোরজবরদস্তি ও প্রলোভন দেখিয়ে গবেষণায় অংশগ্রহণ করানোর প্রবণতাকে প্রতিরোধ করা। অন্যদিকে এটি গবেষক ও সাবজেক্ট-এর সম্পর্ক উন্নয়নেও সাহায্য করে থাকে। গবেষণায় যাদেরকে সাবজেক্ট হিসেবে নির্বাচন করা হয় তাদের স্বাধীনতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, গবেষণায় অংশগ্রহণ করবে কি করবে না, অথবা গবেষণা বা ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করার ফলে তার স্বাস্থ্য ও মানসিক ঝুঁকি আছে কিনা এসব বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা খুবই প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তাই অবগতিক্রমে সম্মতির শর্ত পূরণে সাহায্য করে থাকে।

গবেষণার প্রয়োজনে এ সময় তাদেরকে সিফিলিসের জন্য কোনো ঔষধ বা চিকিৎসা দেওয়া হয় নি। চিকিৎসাবিহীন অবস্থায় সিফিলিস রোগ কোন পর্যায়ে যায় তা পরখ করাই ছিলো এই গবেষণার লক্ষ্য। এই গবেষণার সময়সীমা ছিলো ছয় মাস, কিন্তু তা পরিচালিত হয়েছিলো আরো চল্লিশ বছর। ১৯৭২ সালে *New York Times* এ সম্পর্কে প্রকাশিত প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার হেলথ্ অ্যাফেয়ার্সের সায়েন্টিফিক সহকারী সেক্রেটারির দায়িত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি লক্ষ্য করেছে, গবেষণাটি একেবারেই অনৈতিক। পরিণতিতে সরকার তাদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ ক্ষমা চান। গবেষণার ইতিহাসে এটি বিপদজনক Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male হিসেবে সমধিক পরিচিত।

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তসমূহের মতো আরো অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যা ছিলো মানুষের মর্যাদা ও স্ব-শাসন বিঘ্নের ভয়ঙ্কর ইতিহাস। এসব দৃষ্টান্ত বিজ্ঞানী নীতি নির্ধারক উভয়কে ইঙ্গিত করেছে যে, গবেষণার জন্য ব্যবহৃত স্যাম্পল ও উপাত্তসমূহ নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কিনা, কিংবা যুক্তিযুক্ত কিনা তা পরখ করে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এ সম্পর্কিত আলোচনায় বুলগার জানান, ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত নুরেমবার্গ কোডটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো নাজি বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের কৃতকর্মের বিচারের জন্য। এটি সর্বমোট দশটি নীতির সমাহার। কোনো গবেষণায় মানুষ যদি অংশগ্রহণকারী হয় সেক্ষেত্রে দশটি নীতি অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই দশটি নিয়মের ইতিবাচক প্রতিফলন হিসেবে আমরা অবগতিক্রমে সম্মতির বিকাশ লক্ষ করি। নুরেমবার্গ কোডে বলা হয়েছে— যদি কেউ কোনো গবেষণায় বা পরীক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তাহলে ঐ গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর সম্মতি হতে হবে স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে। অবগতিক্রমে সম্মতির ইতিহাস প্রসঙ্গে ফাদেন ও বিচাম[২] একথাই বলেন। বিশেষ করে মেডিকেল গবেষণায় যে নৈতিক দুর্দশা ও নৈতিক অপমানের জন্ম হয় তারই সূত্র ধরে অবগতিক্রমে সম্মতির বিকাশ। ডব্লিউ টি রিখ[৩] একই দাবি করেন। তিনি বলেন, নৈতিক অপব্যবহার রোধ করার লক্ষেই সামাজিক বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির অবতারণা করা হয়। গবেষণায় যারা অংশগ্রহণকারী তাদের মর্যাদা, স্ব-শাসন ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করে সম্মতি আদায় করার নির্দেশনাই হলো অবগতিক্রমে সম্মতির মূলনীতি।

নুরেমবার্গ ট্রায়ালের সমান্তরাল প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় হেলসিংকি ঘোষণায়[৪]। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর নিরাপত্তা জোরদার ও গবেষণা প্রটোকলের জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নীতিমালা রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে এ ঘোষণায়। একই সঙ্গে গবেষণা প্রতিবেদনকে বহিঃপরীক্ষক বা বিশেষজ্ঞ দ্বারা যাচাইকৃত হতে হবে, যাচাইয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশের অনুমোদন দেবার

---

[২] Faden and Beauchamp, 1986, p. 87.

[৩] Reich, W. T., 1996. 'Bioethics in the United States', in, *History of Bioethics: International Perspectives*, (eds.) Dell'oro, R., and Viafora, C., San Francisco: International Scholars Publications, p. 83.

[৪] WMA Declaration of Helsinki, 1964. " Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects", Adopted by the 18th WMA General Assembly, Helsinki, Finland, June 1964, included and corrected 64th WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 2013, Articles : 25-32.

পরামর্শ করা হয়েছে। হেলসিংকি ডিক্লেরেশনের মতো বেলমন্ট রিপোর্টেও[৫] অবগতিক্রমে সম্মতির প্রসঙ্গ এসেছে। বেলমন্ট রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, পৃথিবীর নানা জায়গায় এখনও গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগী নানা রকম অবিচারের সম্মুখীন হচ্ছে। অজানা রোগের প্রাকৃতিক গতি-প্রকৃতি বোঝার জন পৃথিবীর নানা স্থানে এখনও নিষ্প্রভ ও শারীরিকভাবে অসংবেদনশীল শিশুদের টীকা প্রদান করা হচ্ছে। এরকম আরো অসংখ্য বিষয়ের প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকায় প্রণয়ন করা হয় National Research Act of 1974। এরই পথ ধরে পরবর্তীতে Institutional Review Board (IRB) প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়। উক্ত বোর্ডের কাজ হলো গবেষণার প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে গবেষণা পরিচালনা করা এবং লক্ষিত স্বার্থগোষ্ঠী কিংবা অংশগ্রহণকারীকে অবহিত করার ভিত্তিতে সম্মতি আদায় করা। এই সম্মতিই অবগতিক্রমে সম্মতি হিসেবে সমধিক-পরিচিত।

সম্মতির প্রসঙ্গটি এসেছে অংশিদারিত্বের ভাবনা থেকে। এ ভাবনার কারণে মনে করা হয় যে, কোনো স্বাস্থ্যসেবায় রোগী, বা গবেষণায় অংশগ্রহণকারীকে প্রকৃত অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা জরুরি। অবগতিক্রমে সম্মতির মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীর স্বার্থ, উপকার ও ভূমিকা নির্ধারণ করা যায়। ভোক্তাকেন্দ্রিক (Consumer-centred) মনোভাব সৃষ্টিতেও অবগতিক্রমে সম্মতি সাহায্য করে থাকে। অবগতিক্রমে সম্মতির কারণে কমিউনিটির সদস্যদের সেবা, কল্যাণ ও স্বার্থ অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অবগতিক্রমে সম্মতি স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও গুণগত মান নিশ্চিত করতে সাহায্য করে থাকে। স্বাস্থ্যখাতে প্রযোজ্য সেবা, কৌশল, ও পদ্ধতির যথাযথ বণ্টন নিশ্চিত করে থাকে। চিকিৎসক রোগীকে যেসব চিকিৎসা দেবেন অবগতিক্রমে সম্মতির কারণে তিনি রোগীর সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কেও অবহিত করবেন। উক্ত বিষয়ে অন্য কোনো বিকল্প আছে কিনা, চিকিৎসার সফলতা বা ব্যর্থতা রয়েছে কিনা তাও রোগীকে অবহিত করবেন। গবেষণার ক্ষেত্রে রোগীর স্থলাভিষিক্ত হবে গবেষণা-অংশগ্রহণকারী। এখানে গবেষক হলেন চিকিৎসকের সমপর্যায়ের। আর রোগীর সমপর্যায়ের হলেন অংশগ্রহণকারী। গবেষক ও অংশগ্রহণকারীর মধ্যে সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণ করাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রয়াস।

গবেষণা কৌশল ও পদ্ধতি

উক্ত গবেষণা কর্মটি পরিচালনার জন্য পর্যবেক্ষণমূলক ও ধারণাগত বিশ্লেষণ (Emprical and Conceptual Analysis) উভয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে সাক্ষাৎকার রীতি অনুসরণ করেছি। সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের কয়েকটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি উচ্চশিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আই.আর.বি'র সদস্য, গবেষণায় অংশগ্রহণকারী/উপকারভোগী, গবেষক ও প্রতিষ্ঠান প্রধান বা নির্বাহীদের সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সচেতনতার অবস্থাটি কোন্ পর্যায়ে রয়েছে সাক্ষাতের মাধ্যমে আমরা তা জানতে

[৫] WMA, 2000. "Declaration of Helsinki", World Medical Association, http://www.wma.net/e/policy/b3.htm, accessed : 10 July, 2016.

পেরেছি। সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নসমূহের উত্তর থেকে জানতে পেরেছি যে, অবগতিক্রমে সম্মতির নৈতিক ভিত্তি, এ সম্পর্কিত জ্ঞান, সচেতনতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান। বিশেষ করে অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি তাদের মনোভাব ও জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা অর্জনই উক্ত গবেষণার লক্ষ্য। অংশগ্রহণকারীদের এ সম্পর্কিত কয়েকটি উপাত্ত এখানে প্রদান করা হলো :

সারণী ১ : অবগতিক্রমে সম্মতির বিভিন্ন ক্ষেত্র ও অংশগ্রহণকারী

প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	শিক্ষাস্তর	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা	নারী	পুরুষ
১. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	১০টি	১. স্নাতক ২. স্নাতকোত্তর	১৮০জন	৮০	১০০
২. মেডিকেল কলেজ	০১টি	৩.শিক্ষক ও গবেষক	৬০জন	২০	৪০
৩. প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	০১টি		১৫জন	৫	১০
অন্যান্য	০৩টি		৪৫জন	১৫	৩০

ক. প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বণ্টন: পছন্দের তালিকায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ মোতাবেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও অধিকতর। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর এই হার হলো যথাক্রমে ১৮০ : ৬০: ১৫: ৪৫। এখানে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, সর্বোচ্চ অংশগ্রহণকারী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর মেডিকেল কলেজ, প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য।

খ. লিঙ্গ বণ্টনের বিষয়টি গোটা গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলেও উক্ত গবেষণায় প্রতি-অংশগ্রহণকারীকে সম-একক হিসেবে বিবেচনা করেছি। লিঙ্গ বণ্টনের বিষয়টি এখানে দেখা যাক :

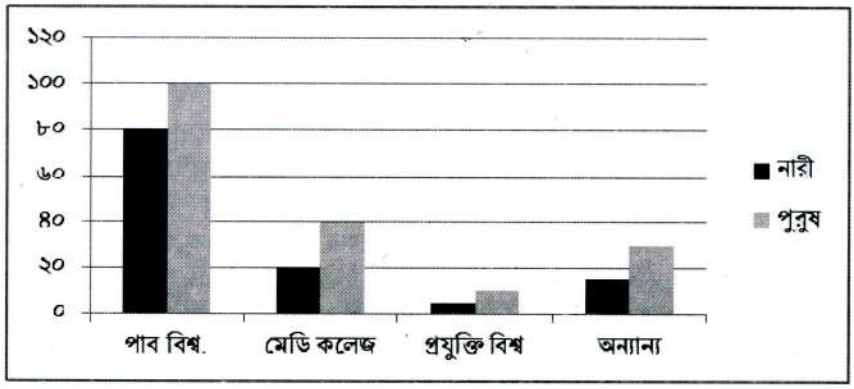

উপর্যুক্ত লেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লিঙ্গ বণ্টনে নারী অপেক্ষা পুরুষ অংশগ্রহণকারীদের আনুপাতিক হার বেশি। গবেষণার মাত্রা ও এ সম্পর্কিত ধারাটি বোঝার জন্য উপর্যুক্ত তালিকা থেকে প্রতিষ্ঠান, অংশগ্রহণকারী ও লিঙ্গভিত্তিক বণ্টন সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছি।

উক্ত গবেষণায় আরো কয়েকটি বিষয় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে:

১. গবেষণাকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীকে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করতে হবে।

২. গবেষণায় সাক্ষাৎপ্রার্থীর (রিসার্চ সাবজেক্ট) মৌখিক অবগতিক্রমে সম্মতি (Informed Consent), গোপনীয়তা (Confidentiality) সংরক্ষণ করা হয়েছে। একারণে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর নাম ও বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয় নি। সাক্ষাতপ্রার্থীদের কাছে প্রশ্নের একটি লিখিত অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্নসমূহ এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যার সাহায্যে অংশগ্রহণকারী অনায়াসে অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পর্কে বুঝতে পেরেছে। অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীই বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করছেন, কেউবা গবেষণাকর্মের সহকারী হিসেবে কাজ করছেন। এদের সবাইকে উক্ত গবেষণার অংশগ্রহণকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতি: বাংলাদেশ বাস্তবতা

চিকিৎসা বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির শর্তটি প্রাসঙ্গিক কারণে একটি আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশ বাস্তবতায় এর প্রয়োজন ও অপরিহার্যতা নানা কারণে গুরুত্ব বহন করে। বেশ কিছু প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এর প্রাসঙ্গিকতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমেই যেসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে:

১. বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কি অবগতিক্রমে সম্মতির রীতি অনুসরণ করা হয়?

২. অবগতিক্রমে সম্মতির রীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কোন্ ধারাটি অনুসরণ করা হচ্ছে? উক্ত প্রশ্নের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা হলো— বাংলাদেশ বাস্তবতায় অবগতিক্রমে সম্মতির ধরন কী? এ কি পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব (Paternalistic)? দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর জানার পূর্বে আমরা জেনে নিতে পারি পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব কী?

পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব হলো অনেকটা কর্তার ইচ্ছাই কর্ম করার সঙ্গে তুলনীয়। আমাদের সামাজিক জীবনের নানা স্তরে এখনও পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব ক্রিয়াশীল রয়েছে। এ ধারা অনুসারে, ব্যক্তির ইচ্ছা, পছন্দ, স্বাধীনতা, মতামত এমন কী ব্যক্তির স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গুরুত্ব পায় না। গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যারা গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তাদের ভূমিকা এখানে গৌণ। চিকিৎসার ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব দাবি করছে যে, চিকিৎসকই ভালো জানেন। চিকিৎসকের এই ভালো জানার অর্থ হলো রোগীর স্বার্থ, রোগীর কল্যাণ কীভাবে বৃদ্ধি পাবে তা নিয়ে চিকিৎসকই ভাববেন, অন্য কাউকে ভাবতে হবে না। আবার গবেষণার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীর কল্যাণ বা লাভ কীসে আসে তা নিয়ে গবেষকই ভাববেন। অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা রাখার কোনো সুযোগ নেই। গবেষণায় গবেষক, আর চিকিৎসা সেবায় চিকিৎসক সিদ্ধান্ত নেবেন গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ও রোগীর কীসে লাভ, বা কীভাবে রোগী সেরে উঠবেন। স্বাধীনতা (Liberty), গোপনীয়তা (Confiedntiality),

অংশগ্রহণকারীর স্ব-শাসন (Autonomy), কিংবা গবেষণালব্ধ ফলাফলের সঙ্গে অংশগ্রহণকারীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব (Conflict of interest) রয়েছে কিনা তাও জানার প্রয়োজন নেই। পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্বে অংশগ্রহণকারী ও গবেষক, চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যে একতরফা সম্পর্ককে মেনে নেয়া হয়। এ সম্পর্কের কারণে গবেষণা পরিচালক দাবি করেন, লব্ধ গবেষণা ফলাফল অংশগ্রহণকারীর জন্য, সমাজের জন্য উপকারী, এই উপকারের কারণেই তাদেরকে গবেষণা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হবে। অন্য কোনো বিকল্প ভাবার সুযোগ এখানে নেই।

গবেষণা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে আরো সহজ করা যেতে পারে। যেমন, টীকা কর্মসূচি সম্পর্কে চিকিৎসক মনে করতে পারেন, টীকা কর্মসূচি জনগোষ্ঠীর সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে, ভবিষ্যতে তাদের এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কমে আসবে। **শুধু এই স্বার্থে ব্যক্তিকে উক্ত কর্মসূচির আওতায় আসতে হবে না। এখানে সাবজেক্টের পছন্দ, স্বাধীনতা বা বিকল্প নির্বাচনের সুযোগ সৃষ্টি করা অপেক্ষা তাদেরকে টিকা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসাই হলো কর্তব্য কর্ম। পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব প্রভাবিত গবেষণার ক্ষেত্রে** গবেষক দাবি করবেন, গবেষণায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে সংকটের প্রকৃত কারণ জানা যাবে যা নির্মূলের মাধ্যমে জনগণের সত্যিকার স্বার্থ উদ্ধার হবে। অন্যদিকে, অবগতিক্রমে সম্মতির মূলকথাই হলো লাভালাভের চেয়ে অংশগ্রহণকারীর পছন্দ ও স্বাধীনতাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। স্পষ্টতই লক্ষ করা যাচ্ছে, অবগতিক্রমে সম্মতির দার্শনিক লক্ষ্যের সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্বের বৈপরীত্য রয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্বে স্বাধীনতা ও পছন্দ অপেক্ষা লাভালাভের প্রতিই বেশি গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। এ মতাদর্শ পরিণতিতে সম্মতি ও অবগতি উভয়ের প্রতি অবহেলা করে থাকে।

পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্বের বহুবিধ সংকট রয়েছে। এ সম্পর্কে অন্য যে প্রশ্নটি করা যায় তাহলো— সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব কি অভিজ্ঞতানির্ভর, নাকি মূল্যায়নমূলক? এ সম্পর্কে প্রথমেই বলা যায়— গোটা প্রক্রিয়াটি স্বনিহিত অর্থে মূল্যায়নমূলক নয়। কারণ ব্যক্তি যখন কোনো বিষয়ে অন্য কারো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, অবশ্যাম্ভাবীভাবে সেই সিদ্ধান্তটি দু'জনের মধ্যে আলোচনা, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও উপকারের সম্মতির ভিত্তিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এসব হলো পূর্বশর্ত। কিন্তু এ মতবাদ এসব পূর্বশর্তকে অনুসরণ করে না। অনুসরণ না করার ফলে অংশগ্রহণকারীর স্ব-শাসন, মতামত ও কল্যাণ সবই লঙ্ঘিত হয়। পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্বে এ ঘটনাটি যেভাবে ঘটছে তা একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখাতে পারি :

ধরা যাক, শফিক রহিমের প্রতি পিতৃতান্ত্রিক 'নীতি-প' অনুসারে কাজ করছে। এর অর্থ হলো :

১. 'নীতি-প' অনুসারে যে কাজটি করা হয়েছে তা রহিমের স্বাধীনতা ও স্ব-শাসনকে বাধাগ্রস্ত করছে,

২. 'নীতি-প' কাজটি রহিমের সম্মতি বা মতামত নেবার প্রয়োজন বোধ করে নি,

৩. শফিক হয়তো ভেবেছেন, 'নীতি-প' কাজটি করলে রহিমের স্বার্থ বৃদ্ধি, মূল্যের বিকাশ ও মঙ্গল সাধিত হবে।

উপর্যুক্ত তিনটি শর্তের আলোকে বলা যায়: স্বাধীনতা, স্ব-শাসন ও মতামত বিবেচনা না করে

রহিম সাপেক্ষে শফিকের ভাবনাই পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব। এজন্য বলা যায়— পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্বে ভোক্তা, অংশগ্রহণকারী (গবেষণার ক্ষেত্রে) বা রোগীর (চিকিৎসার ক্ষেত্রে) স্বাধীনতা ও স্ব-শাসনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে না। এখানে গুরুত্ব পায় শারীরিক ও মানসিক চাপ, অনেক সময় মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করাও এর একটি লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। একই সঙ্গে ব্যক্তির জানার অধিকারকেও হেয় প্রতিপন্ন করা হয়ে থাকে। প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান থেকে ব্যক্তিকে বিরত রেখে ব্যক্তির ওপর অযাচিত শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হলো এর একটি দিক।

উপর্যুক্ত বিবেচনাকে সামনে রেখেই প্রশ্ন আসছে— বাংলাদেশ বাস্তবতায় [উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিপ্রেক্ষিতে] গবেষণায় কি অবগতিক্রমে সম্মতির প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়? এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের লক্ষ্যে উক্ত গবেষণায় তিনটি দিক থেকে বোঝার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে :

ক. গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পর্কে জ্ঞান (Knowledge),

খ. গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পর্কে মনোভাব (Attitude),

গ. গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির অনুশীলন (Practices)।

উপর্যুক্ত তিনটি দিক সম্পর্কে জানার জন্য প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রশ্নসমূহের উত্তর অনুসন্ধানের ক্রমকে আমরা লাইকার্ট স্কেল পদ্ধতিতে পরিমাপ করেছি। এই স্কেলের আওতায় সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীর মতামতকে পাঁচটি ধাপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সারণী ২ : লাইকার্ট স্কেল বিন্যাস

সবল অসম্মতি	অসম্মতি	সিদ্ধান্তহীনতা	সম্মতি	সবল সম্মতি
১	২	৩	৪	৫

খুব মন্দ → খুব ভালো/ মন্দ নিকৃষ্ট

অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পর্কে জ্ঞান

বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ১২০ জন নারী গবেষক, ও ১৮০ জন পুরুষ গবেষকের মধ্যে অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পর্কে কতটুকু জ্ঞান রয়েছে তা জানার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত তথ্যাদি নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সারণী ৩ : অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পর্কে জ্ঞান

প্রতিপাদ্য বিষয়	গবেষক									
	মহিলা (সংখ্যা ১২০ জন)					পুরুষ (সংখ্যা : ১৮০ জন)				
	১	২	৩	৪	৫	১	২	৩	৪	৫
১.আপনি কি জানেন অবগতিক্রমে সম্মতি কী?	২০	৬০	২০	১৫	৫	৩০	৫০	৪০	৪০	২০
২ গবেষণায় কি অবগতিক্রমে সম্মতির প্রয়োজন রয়েছে?	৩০	৪০	৩০	১০	১০	৩০	৫০	৬০	৩০	১০
৩. অবগতিক্রমে সম্মতি কি লিখিত না মৌখিক?	৪০	৪০	১৫	১৫	১০	৫০	৪০	৫০	৩০	১০

৪. গবেষণায় কি অংশগ্রহণকারীকে চাপ প্রয়োগ করা হয়?	২০	৪০	২০	২০	২০	৬০	৫০	৩০	৩০	১০
৫. গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির	৫০	২০	৩০	১০	১০	৭০	৫০	২৫	২৫	১০
ক. কে অবগত করেন?										
খ. কে সম্মতি জানান?										
৬. অবগতিক্রমে সম্মতি কি অংশগ্রহণকারীর গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি করে?	৩৫	৩০	২৫	২৫	৫	৭০	৬০	৩০	১৫	৫
৭. অবগতিক্রমে সম্মতিতে কি অংশগ্রহণকারীর স্ব-শাসন মেনে নেওয়া হয়?	৪০	২৫	২৫	২৫	৫	৬৫	৫৫	৩০	২০	৫
৮. অংশগ্রহণকারীকে গবেষণা সম্পর্কে কি বিস্তারিত জানানো হয়?	৩৫	৩৫	২০	২০	১০	৬০	৬৫	৩৫	১৫	৫
৯. গবেষণা প্রোটোকল সম্পর্কে কী জানেন?	২০	৩৫	৩৫	১৫	১৫	৪০	৪০	৩০	৪০	৩০
১০ অংশগ্রহণকারীকে কী জানানো হয়?										
ক. যেকোনো মুহূর্তে	২২	৩৪	২৮	২৬	১০	৪২	৪৬	৪৩	৩৪	১৫
অংশগ্রহণকারী গবেষণা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করতে পারেন, খ. তাতেও তার উপর কোনো চাপ প্রয়োগ করা যাবে না, প্রলোভন দেখানো যাবে না। গ. অংশগ্রহণকারীরর ঝুঁকি আছে কিনা তা জানানো।										

উপর্যুক্ত তথ্য উপাত্তকে নিচের স্তম্ভলেখে দেখাতে পারি :

স্তম্ভলেখ -১ : অবগতিক্রমে সম্মতির জ্ঞানের মাত্রা

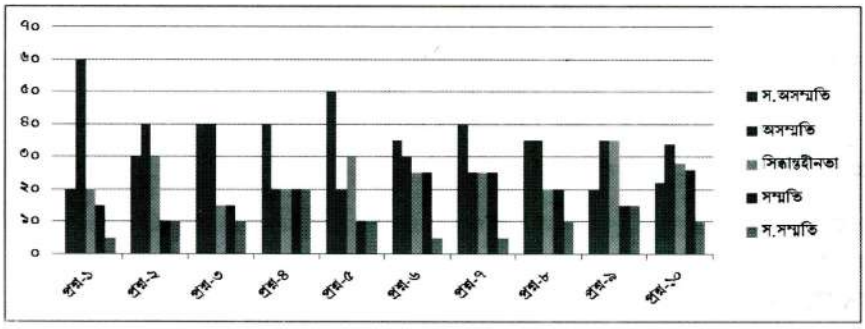

উপর্যুক্ত স্তম্ভলেখে মোট দশটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লক্ষ করে দেখব প্রতিটি প্রশ্নোত্তরের প্রতিক্রিয়ার মাত্রা ভিন্ন। তবে সবল সম্মতি অপেক্ষা অসম্মতির দিকে ঝোকটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি অংশগ্রহণকারী ও গবেষকদের জ্ঞান কীরকম হবে তা জানার জন্য নির্ধারিত প্রশ্নসমূহের ভিত্তিতে গৃহীত উপাত্তকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের (Standard Deviation) মাধ্যমে দেখাতে পারি :

সারণী ৪: লিঙ্গভেদে প্রশ্নভিত্তিক আদর্শ বিচ্যুতি

প্রশ্ন সেট	নারী	পুরুষ
প্রশ্ন-১	৯.৬১৮	৯.৬১৮
প্রশ্ন-২	৪.১৮৩	৬.৫১৯
প্রশ্ন-৩	৫.৪৭৭	৪.১৮৩
প্রশ্ন-৪	৮.৯৪৪	১৯.৪৯
প্রশ্ন-৫	১৬.৭৩	২৩.৮২
প্রশ্ন-৬	১১.৪	২৮.১৫
প্রশ্ন-৭	১২.৪৫	২৪.৭৫
প্রশ্ন-৮	১০.৮৪	২৬.৫৫
প্রশ্ন-৯	১০.২৫	৫.৪৭৭
প্রশ্ন-১০	৮.৯৪৪	১২.৫৫

উপর্যুক্ত সারণীর আলোকে অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পর্কে গবেষকদের জ্ঞান কতোটুকু তা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পেয়েছি। উপস্থাপিত তথ্য অনুসারে, সবল সম্মতির দিকে সূচক একেবারেই নিচের দিকে (১০ এর উর্ধ্বে নয়)। অবগতিক্রমে সম্মতি করা উচিত কিনা? এরকম বাস্তবতায় অংশগ্রহণকারী নারী ও পুরুষ উভয়ের যে হার তাতে লক্ষ্য করা গেছে যে, সবল অসম্মতি ও অসম্মতি উভয়ের দিকে আনুপপাতিক হার উর্ধ্বমুখী (১০ থেকে ৫০ মুখী, স্তম্ভলেখ-২)। এই উর্ধ্বমুখী রেখা প্রমাণ করে যে, গবেষকদের মধ্যে অবগতিক্রমে সম্মতির ধারণা অত স্পষ্ট নয়।

সনাক্তকৃত উপর্যুক্ত সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করা যেতে পারে? উপর্যুক্ত প্রসঙ্গে কয়েকটি ধারণা নিচে আলোচনা করছি। বিপরীত দিকে, সবল সম্মতির দিকে এই মাত্রা ১০ এর নীচে (স্তম্ভলেখ-২)। সুতরাং, তুলনামূলক এই হার থেকে সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বাংলাদেশের প্রচলিত গবেষণার ধারায় অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পর্কে গবেষক ও অংশগ্রহণকারীদের মনোভাব বা জ্ঞান সন্তোষজনক নয়। সিদ্ধান্তের এই মাত্রাটিকে সমাধান করার জন্য আমরা অবগতিক্রমে সম্মতির কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করতে পারি।

প্রথমত. অবগতিক্রমে সম্মতির অনুমোদন

আলোচনার শুরুতে আমরা জেনে নেব কীভাবে অবগতিক্রমে সম্মতি পরিচালনা করতে হয়। সম্মতি নেবার প্রক্রিয়াটি কাদের দ্বারা সম্পন্ন হবে? চূড়ান্ত সম্মতিপত্র কীভাবে প্রস্তুত করতে হবে? নিচের চিত্রে এর একটি রূপরেখা উপস্থান করা হলো।

চিত্র ১ : অবগতিক্রমে সম্মতির রূপরেখা

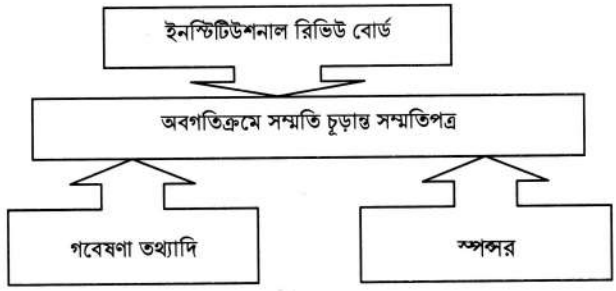

দুই. অবগতিক্রমে সম্মতি একটি প্রক্রিয়া

প্রথমেই আমরা জেনে নিতে পারি যে, অবগতিক্রমে সম্মতি কি শুধুই সম্মতিপত্র, নাকি প্রক্রিয়া? উল্লেখ্য যে, অবগতিক্রমে সম্মতির জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, এসব শর্ত অবশ্যম্ভাবী কারণে ধাপে ধাপে বিবেচনা করতে হয়। বিষয়টি এরকম নয় যে, একটি আবেদনপত্র তাতে স্বাক্ষর করলেই কাজ শেষ হয়ে গেল। এর যে সব ধাপ রয়েছে তার প্রত্যেকটিকে পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করতে হয়। পর্যায়ক্রমে এই অনুসরণের কারণে বলা যায়, অবগতিক্রমে সম্মতি হলো একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া এমন যে, যিনি গবেষণায় অংশগ্রহণ করবেন তাকে ঐ গবেষণা ও ট্রায়াল সম্পর্কে খুঁটিনাটি অবহিত করতে হবে। অবহিতকরণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে এ সম্মতি জানাবেন। নৈতিক শর্তাদির আলোকে সুষ্ঠু সংগতিপূর্ণ গবেষণার জন্য প্রয়োজন অবগতিক্রমে সম্মতি। এটি শুধু কতোগুলো শর্ত ও নীতি উল্লেখ সাপেক্ষ ফর্মে স্বাক্ষর করা নয়। গবেষণায়, ট্রায়ালে কিংবা চিকিৎসায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্মতির মৌলিক কৌশলই হলো অবগতিক্রমে সম্মতি। অবগতিক্রমে সম্মতি প্রণয়নের জন্য আইনীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজন রয়েছে। এই কাঠামোর মধ্যে গবেষণা বা উপকারভোগী বা ভোক্তা কর্মকাণ্ড পরিচালনা বা অনুমোদনের জন্য ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ড (আই.আর.বি) থাকতে হবে। আই.আর.বি এর অধীনেই কেবল অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পন্ন হতে হবে। উক্ত প্রক্রিয়াটির ক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ:

এক. অবগতিক্রমে সম্মতিপত্রের পর্যালোচনা করতে হবে । পর্যালোচনায় গুরুত্ব পাবে:

১. গবেষণার জন্য গৃহীত প্রজেক্ট থাকতে হবে।

২. প্রজেক্টটিতে যেসব প্রস্তাবনা থাকবে তাকে অবশ্যই স্পষ্ট, বোধগম্য, সহজ ও সরল পাঠযোগ্য হতে হবে। সর্বোপরি প্রস্তাবনায় গোটা প্রজেক্টের ধারণার প্রতিফলন থাকতে হবে।

দুই. অবগতিক্রমে সম্মতির আদায়ের জন্য প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। এখানে প্রযোজ্য হলো:

কার জন্য অবগতিক্রমে সম্মতি, কে অবগতিক্রমে সম্মতি আদায় করবেন, কোথায় অবগতিক্রমে সম্মতি নেওয়া হবে, কীভাবে নেওয়া হবে, এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।
প্রশ্ন হলো সম্মতি প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে, অবগতিক্রমে সম্মতির প্রক্রিয়াটিকে আমরা এভাবে দেখাতে পারি:

চিত্র ২: সম্মতি প্রক্রিয়া

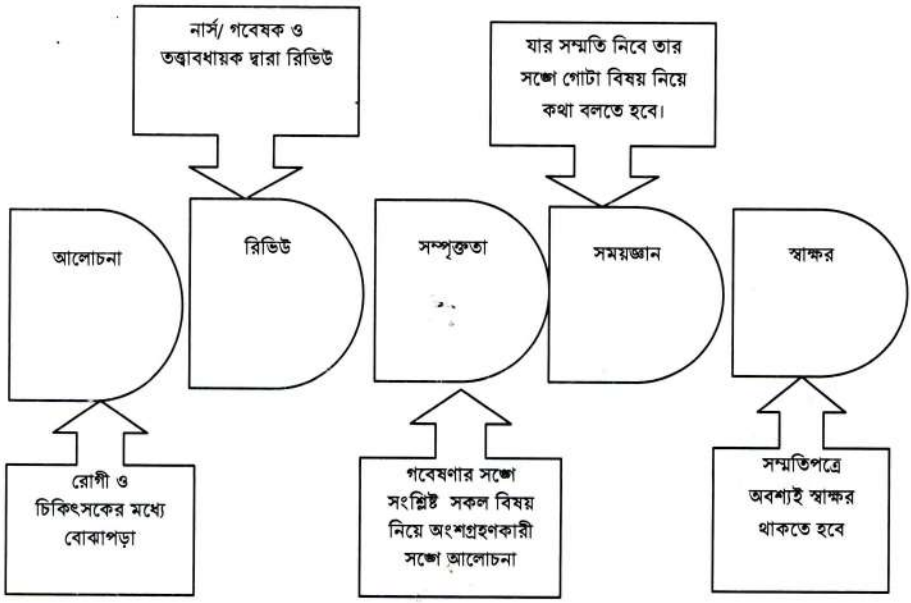

সম্মতির গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য চারটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে। ধারাবাহিকভাবে এর মধ্যে থাকবে পর্যালোচনা, মূল্যায়ন, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও সম্মতি প্রদান। এ চারটি ধারা পর্যায়ক্রমে চারটি ধাপে সম্পন্ন হবে। সম্মতির পরিপূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে এভাবে দেখাতে পারি:

চিত্র ৩: অবগতিক্রমে সম্মতির পরিপূর্ণ প্রক্রিয়া

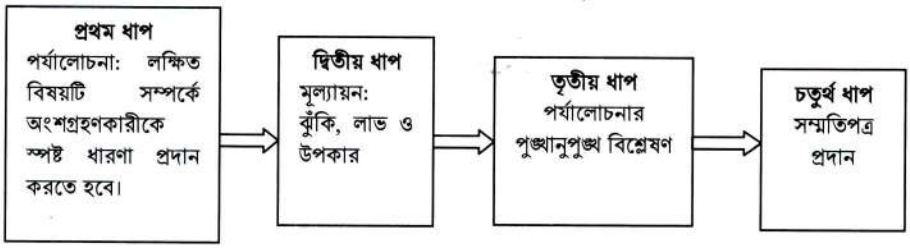

প্রথম ধাপ : যাদের সম্মতি প্রয়োজন তাদেরকে মুক্ত ও স্বাধীনভাবে বিবেচনায় আনতে হবে। কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা, প্রলোভন কিংবা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে সম্মতি আদায় করা যাবে না। যে বিষয়টিতে সম্মতি প্রদানের জন্য বলা হচ্ছে— সে সম্পর্কে তাকে স্পষ্ট, খুঁটিনাটি জানাতে হবে যেন ঐ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীর কোনো অস্পষ্টতা না থাকে। গোটা বিষয় সম্পর্কে তথ্য, ঘটনা, সমস্যা, লক্ষ্য, ফলাফল ইত্যাদি প্রয়োজন হলে পুনরাবৃত্তি করতে হবে। সুনির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী ও প্রথমপক্ষ উভয়ই প্রশ্ন করে সমস্যাটি সম্পর্কে জেনে নিতে পারবেন। অংশগ্রহণকারীকেও প্রশ্ন করার পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দিতে হবে। প্রয়োজনে সময়ক্ষেপণও করা যেতে পারে। অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণকে সক্রিয় ও নিশ্চিত করার জন্য গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে

তার সঙ্গে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। পর্যালোচনা এমন হতে হবে যেন অংশগ্রহণকারী গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে। গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করতে হবে স্পষ্ট ও বোধগম্য ভাষায়। বোধগম্য করার জন্য কয়েকটি শর্ত অনুসরণ করা প্রয়োজন:

১. তথ্যটি প্রয়োজনে বারবার উপস্থাপন করা।

২. তথ্য সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হয়েছে কিনা তা যাচাই বাছাই করা।

৩. পর্যালোচনার জন্য সময়জ্ঞানও জরুরি।

দ্বিতীয় ধাপ : যে বিষয় সম্পর্কে সম্মতি নেওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীকে সকল তথ্যাদি জানাতে হবে। সমস্যা বা বিষয়ের অন্য কোনো বিকল্প আছে কিনা বিকল্পের ঝুঁকি ও উপকার কি তাও অংশগ্রহণকারীকে অবহিত করতে হবে।

তৃতীয় ধাপ. এ ধাপটি হলো সক্রিয়তার পর্ব। এ পর্যায়ে ট্রায়ালে বা গবেষণায় অংশগ্রহণকারীকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, সম্মতিপত্র সরবরাহ করতে হবে। অংশগ্রহণকারী যদি অক্ষম বা নিস্ক্রিয় হয় তাহলে উক্ত কাগজপত্র তার নিকটাত্মীয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধু গ্রহণ করতে পারবেন।

তিন. অবগতিক্রমে সম্মতিপত্রের শর্তাদি

অবগতিক্রমে সম্মতি পত্রে কী করা হবে, আর কী করা যাবে না তারও একটি স্পষ্ট তালিকা থাকবে।

যা করতে হবে	যা করা উচিত নয়
সহজ সরল করে প্রস্তাবনা বা প্রোটোকল লিখুন, ছোট ও সহজ শব্দ ব্যবহার করুন। সমস্যার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করতে হবে। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ঝুঁকি ও মুনাফার বিবরণ থাকতে হবে। সহায়ক বা সহযোগী শব্দের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মোতাবেক ব্যবহার করতে হবে।	জটিল শব্দ বা ধারণার ব্যবহার, জটিল ধরনের ফরম ব্যবহার, ফর্মে অপ্রয়োজনীয় তথ্য ও বর্ণনা উপস্থাপন করা, ব্যক্তিসত্তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন, গবেষণার বিষয়কে জটিল ও অপ্রাসঙ্গিক রাখা

একই ফর্মের দুটি অংশ থাকবে। তবে উল্লেখ্য যে, গবেষণার ক্ষেত্রে অবগতিক্রমে সম্মতির স্বরূপ, আর ডাক্তার চিকিৎসক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবগতি সম্মতির স্বরূপ অভিন্ন হবে না। যেমন, গবেষণার ক্ষেত্রে যে অবগতিক্রমে সম্মতিপত্র প্রদান করা হবে তার দুটি অংশ থাকবে:

ক. প্রথম অংশে গবেষণা সম্পর্কে তথ্যাদি থাকবে,

খ. দ্বিতীয় অংশে থাকবে তথ্যাদির ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীর সম্মতি প্রদান।

এ দুটি একসাথে মিলে হবে 'অবগতিক্রমে সম্মতিপত্র'। গবেষণার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধ, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও বোধের সঙ্গে সমন্বয় করে ভাষা ব্যবহার করতে হবে। গোটা প্রক্রিয়াটিকে এভাবে দেখানো যেতে পারে:

চিত্র ৪ : সম্মতিপত্রে ভাষার ধরন ও স্পষ্টতা

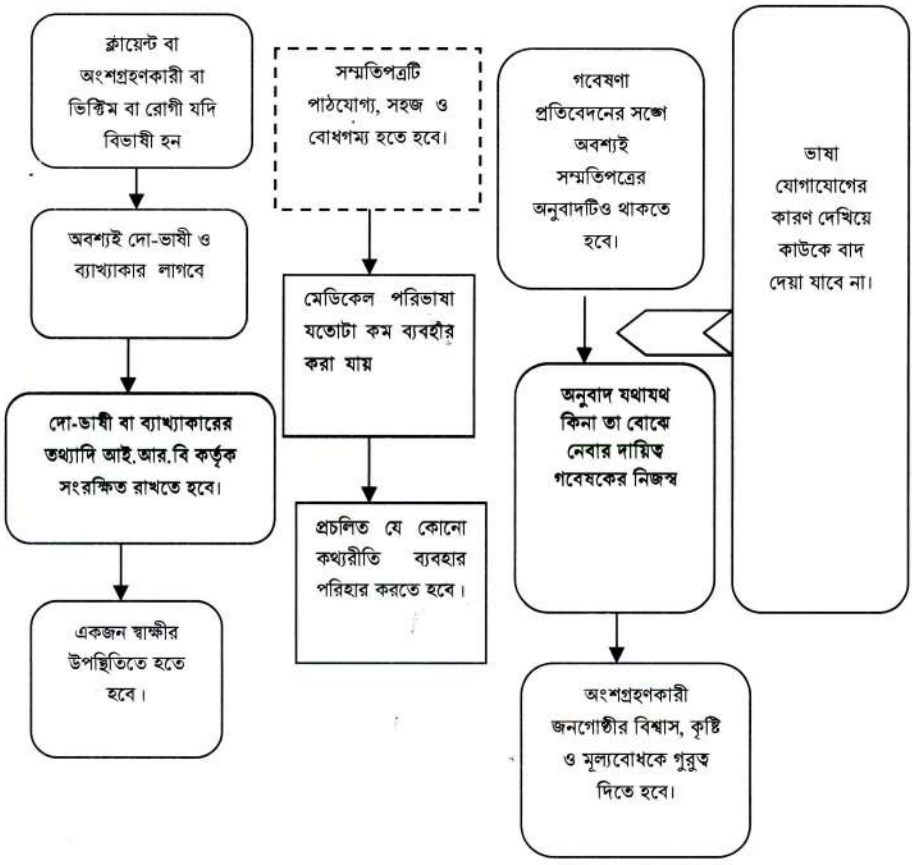

ক. কখন সম্মতি : সম্মতির আরেকটি শর্ত হলো এর সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া। সম্মতির সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ায় যেসব বিষয় গুরুত্ব পাবে :

১. কখন সম্মতি নিতে হবে?

২. যদি প্রতিষ্ঠানের আই.আর.বি'র চাহিদা থাকে তাহলে সে মোতাবেক তা সম্পন্ন করতে হবে।

সম্মতি যদি মৌখিকভাবে হয় সেক্ষেত্রে সাক্ষ্যের প্রয়োজন রয়েছে। এমনও হতে পারে অনেক আই.আর.বি তাদের প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক সাক্ষ্য চাইতে পারে।

খ. কে সাক্ষ্য হতে পারবে : চলমান গবেষণা থেকে নিরপেক্ষ, কিংবা গবেষণা যারা পরিচালনা করছেন তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক নেই কেবল তারাই সাক্ষী হতে পারবেন। এই সাক্ষীকে নিঃশর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দ্বারা তিনি কোনোভাবে প্রভাবিত হতে পারবেন না।

চার. অবগতিক্রমে সম্মতির যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া: প্রোটোকল অনুসারে যে কোনো গবেষণা কর্ম শুরু করবার পূর্বে অবগতিক্রমে সম্মতি একটি পূর্বশর্ত। যেদিন সম্মতিপত্র স্বাক্ষরসহ সম্পাদনের সকল প্রক্রিয়া সমাপ্ত হবে সেদিন থেকেই প্রোটোকল অনুসারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করা যাবে। তবে গবেষণা রেকর্ডের অংশ হিসেবে সকল তথ্য ক্রমান্বয়িক রীতি অনুসারে সংরক্ষণ রাখতে হবে।

পাঁচ. বিপন্ন জাতিগোষ্ঠীও অবগতিক্রমে সম্মতি: বিপন্ন জাতিগোষ্ঠীর (Vulnerable Population) ক্ষেত্রে অবগতিক্রমে সম্মতির জন্য বিশেষ কিছু শর্ত অনুসরণের প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য গবেষককে জেনে নিতে হবে বিপন্ন জাতিগোষ্ঠীর সদস্য কারা? আর শর্তসমূহই বা কী? শিশু ও কয়েদি, নন-ইংলিশ ভাষাভাষি (যেমন আরবী ভাষাভাষি), গর্ভবতী নারী, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তি, শারীরিকভাবে মারাত্মক অসুস্থ, দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত, মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি, জ্ঞানিক দিক থেকে সামর্থহীন (Cognitively Impaired) এদেরকে বিপন্ন জাতিগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। বিপন্ন ও সামর্থ্যহীন ব্যক্তিরা প্রায় ক্ষেত্রেই স্বাধীন সম্মতি দিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে খুব অনায়াসে, সহজে কিংবা নামমাত্র চাপ প্রয়োগে সম্মতি নেওয়া হয়ে থাকে। শারীরিক ও মানসিক কারণে তারা সীমিত স্বাধীনতা উপভোগ করে থাকে।

ছয়. গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর বয়স: অংশগ্রহণকারী যদি ১৮ বছরের নিচে হয় তাহলে কীভাবে সম্মতি আদায় করতে হবে? ১৮ বছরের নিচে সম্মতির প্রয়োজনটি মাইনর কেস হিসেবে গণ্য হবে। অধীনস্থ/মাইনর কেসের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া এভাবে সম্পন্ন হবে:

চিত্র ৫ : অংশগ্রহণকারীর বয়স

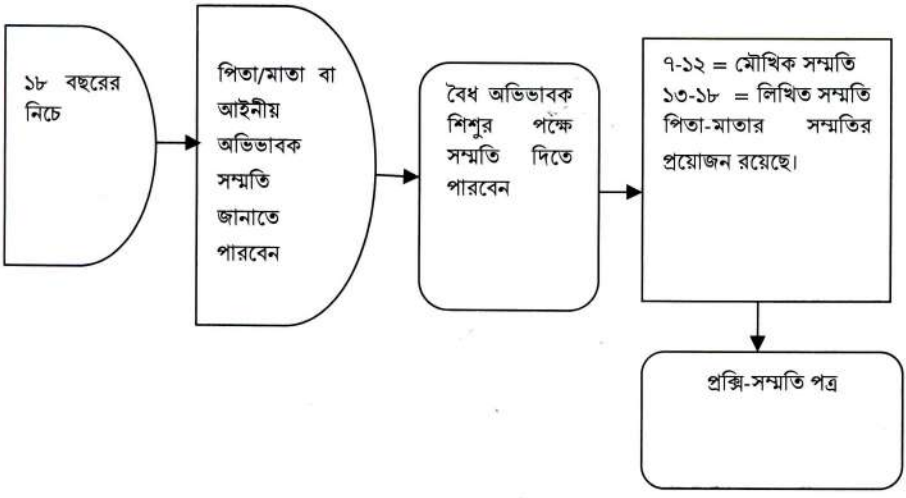

অবগতিক্রমে সম্মতি সংরক্ষণ পদ্ধতি কীরকম হবে?

অবগতিক্রমে সম্মতিপত্র সংরক্ষণ করার জন্য পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ

করার প্রক্রিয়াটি নীচে দেখানো হলো:

সারণী ৫ : অবগতিক্রমে সম্মতি সংরক্ষণ পদ্ধতি

রেকর্ড অব ইনফরমড কনসেন্ট (অবগতিক্রমে সম্মতি সংরক্ষণ) (অবগতিক্রমে সম্মতি পরিচালনার জন্য আইনীয় প্রতিষ্ঠান)
আই.আর.বি আই
অনুমোদিত গবেষণা শিরোনাম: সম্মতিদাতার নাম: হাসপাতাল বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম:
ঠিকানা: গবেষণা প্রধানের নাম ও ঠিকানা অংশগ্রহণকারীর সম্মতির তারিখ:
গবেষণা প্রস্তাবনার বিবরণ: ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, খ. গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি, গ. গবেষণার পরিধি
অংশগ্রহণকারীকে কি কোনো ড্রাগ সেবন করাতে হয়েছে ? হ্যাঁ: না: যদি হ্যাঁ হয় তাহলে : ১. ড্রাগের নাম, ২. গবেষণা পরীক্ষার জন্য কি এসব ড্রাগ ব্যবহার করা হয়েছে, অথবা করা হবে?
অংশগ্রহণকারীর বিশেষ কোনো বাস্তবতা আছে কিনা? যেমন, ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত অবস্থান

সম্মতিপত্রে চূড়ান্তকরণ প্রসঙ্গে

কীভাবে চূড়ান্তপত্র নির্ধারণ করতে হবে সে সম্পর্কেও গবেষকের ধারণা থাকতে হবে। এখানে হয়তো একজন গবেষক আই. আর.বি নির্ধারিত প্রোফর্মা ও গঠন কৌশল মেনে নিতে হবে।

চিত্র ৬: কীভাবে সম্মতিপত্র চূড়ান্ত করতে হবে?

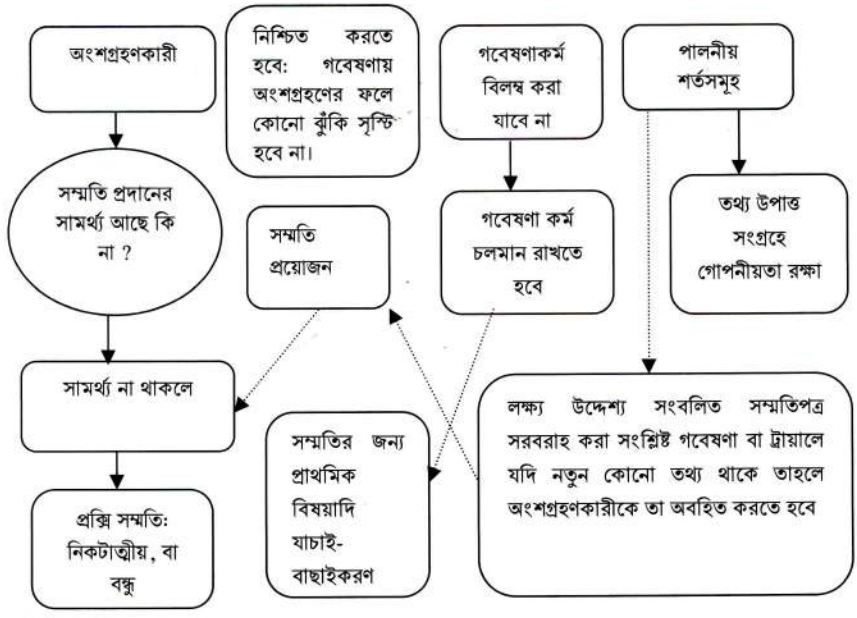

অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি মনোভাব

বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষক, অংশগ্রহণকারীদের অবগতিক্রমে সম্মতি প্রসঙ্গে মনোভাব জানার জন্য গবেষণায় নিম্নোক্ত প্রশ্নাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যবহৃত তথ্যাদি এখানে উপস্থাপন করা হলো:

সারণী ৬: অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি গবেষকদের মনোভাব

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন গবেষণা শুরুর পূর্বে অংশগ্রহণকারীর অবগতিক্রমে সম্মতি নেবার প্রয়োজন রয়েছে?										
	নারী (সংখ্যা : ১২০)					পুরুষ (সংখ্যা : ১৮০)				
প্রতিপাদ্য বিষয়/ লাইকার্ট স্কেল	১	২	৩	৪	৫	১	২	৩	৪	৫
১. অংশগ্রহণকারীর স্ব-শাসন ও মর্যাদা রক্ষার কারণে সম্মতি নেওয়া প্রয়োজন	৩০	৩৫	২৫	২০	১০	৪০	৪০	৪৫	৩৫	২০
২. অংশগ্রহণকারীর কীসে সম্মতি দিবে কিংবা দিবে না সে প্রসঙ্গে তার স্বাধীনতা রয়েছে	২৫	৩০	২০	২৫	২০	৪৫	৩০	৪০	৩৫	৩০
৩. গবেষকের গবেষণা কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার স্বার্থে গবেষণায় অংশগ্রহণ করা উচিত	৩০	২৫	২৫	২৫	১৫	২৫	২৫	৩০	২০	২০

উপর্যুক্ত সারণী-৫ এর আলোকে অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি নারী গবেষকদের প্রতিক্রিয়ার ধরনটি নিচের স্তম্ভরেখায় দেখানো যেতে পারে:

স্তম্ভলেখ ২ : অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি নারী গবেষকদের মনোভাব

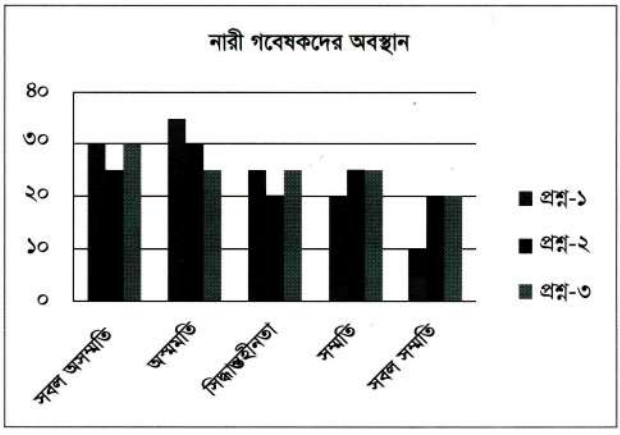

স্তম্ভলেখ ৩: অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি পুরুষ গবেষকদের মনোভাব

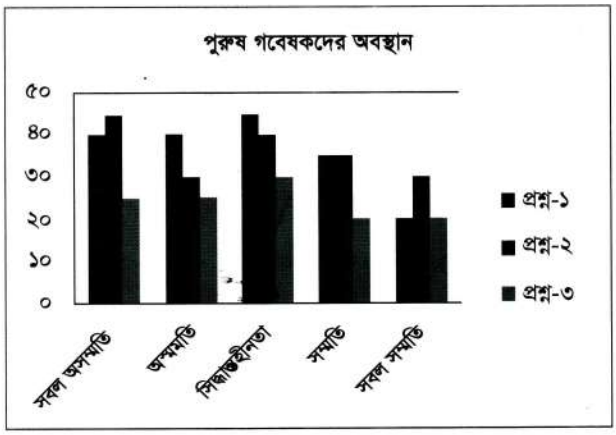

উপর্যুক্ত স্তম্ভলেখ (স্তম্ভলেখ ২ [নারী গবেষকদের জন্য] ও ৩ [পুরুষ গবেষকদের জন্য]) সবল-অসম্মতি ও অসম্মতি উভয়ই ৩০-৩৫ [তদূর্ধ্ব] স্কেলের মধ্যে রয়েছে। সবল-অসম্মতির জন্য নারী গবেষকদের অবস্থান: প্রশ্ন-১ ও প্রশ্ন-৩ সাপেক্ষে ৩০ স্কেল, আর প্রশ্ন-২ সাপেক্ষে ২৫ মাত্রায়। উক্ত স্কেল থেকে আমরা বলতে পারছি যে, অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি নারী গবেষকদের সম্মতি (সবল সম্মতিসহ) অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তুলনামূলকভাবে সবল-অসম্মতিই ক্রিয়াশীল (স্কেল ৩০-৩৫ পর্যন্ত)। আবার, একই সারণীর তথ্য উপাত্তের মধ্যে পুরুষ গবেষকদের অবস্থাটি লক্ষ করা যাক। উপর্যুক্ত স্তম্ভরেখায় (স্তম্ভলেখ ৩) সবল-অসম্মতি ও অসম্মতি উভয়ই ২৫-৩৫ স্কেলের মধ্যে, অন্যদিকে সবল সম্মতি হলো ১০-২০ স্কেল পর্যন্ত। এই স্কেল থেকে আমরা বলতে পারছি যে, অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি (পুরুষ) গবেষকদের সম্মতি (সবল সম্মতিসহ) অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তুলনামূলকভাবে সবল অসম্মতিই ক্রিয়াশীল (স্কেল ২৫-৪৫ পর্যন্ত)। নারী ও পুরুষ উভয় গবেষকদের অবস্থানই একই পর্যায়ে রয়েছে।

উক্ত গবেষণায় আমরা আরেকটি বিষয়ে নিরীক্ষা চালিয়েছি, তাহলো বাংলাদেশে গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির অনুশীলনের মাত্রা কীরকম? এ প্রসঙ্গে আমরা গবেষকদের নিম্নোক্ত বিষয়াদির ওপর প্রশ্ন করি। এসব প্রশ্নের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফলকে এখানে উপস্থাপন করা হলো:

সারণী ৭: অবগতিক্রমে সম্মতির অনুশীলন

অংশগ্রহণকারী ১৬০ জন	অংশগ্রহণকারী ১২০ জন	নারী	সংখ্যা	পুরুষ	সংখ্যা
১. গবেষক হিসেবে আপনি কি অংশগ্রহণকারীর সম্মতিকে গুরুত্ব দেন? ২. অথবা সম্মতি নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করেন?	সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ (সংখ্যা ৬০ জন) নারী (৩০জন) পুরুষ (৩০ জন)	সবল অসম্মতি	৬	সবল অসম্মতি	৭
		অসম্মতি	৬	অসম্মতি	৬
		সিদ্ধান্তহীনতা	৭	সিদ্ধান্তহীনতা	৭
		সম্মতি	৬	সম্মতি	৬
		সবল সম্মতি	৫	সবল সম্মতি	৪
	কলা ও মানবিকী অনুষদ (সংখ্যা ২০ জন) নারী (১০জন) পুরুষ (১০ জন)	সবল অসম্মতি	৩	সবল অসম্মতি	২
		অসম্মতি	৩	সম্মতি	১
		সিদ্ধান্তহীনতা	২	সিদ্ধান্তহীনতা	২
		সম্মতি	১	সম্মতি	৩
		সবল সম্মতি	১	সবল সম্মতি	২
	প্রাণবিজ্ঞান (সংখ্যা ৩০ জন) নারী (১৫জন) পুরুষ (১৫ জন)	সবল অসম্মতি	৪	সবল অসম্মতি	৪
		অসম্মতি	৫	অসম্মতি	৫
		সিদ্ধান্তহীনতা	৩	সিদ্ধান্তহীনতা	২
		সম্মতি	২	সম্মতি	৩
		সবল সম্মতি	২	সবল সম্মতি	১
	চিকিৎসাবিজ্ঞান (সংখ্যা ৪০ জন) নারী (২০জন) পুরুষ (২০ জন)	সবল অসম্মতি	৮	সবল অসম্মতি	৭
		অসম্মতি	১০	অসম্মতি	৬
		সিদ্ধান্তহীনতা	৬	সিদ্ধান্তহীনতা	৪
		সম্মতি	৪	সম্মতি	৬
		সবল সম্মতি	৪	সবল সম্মতি	২

উপর্যুক্ত সারণী থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, অবগতিক্রমে সম্মতি বিষয়ে গবেষকদের জ্ঞান নিম্ন পর্যায়ের। এই নিম্ন পর্যায়ের জ্ঞানের মাত্রা নির্দেশ করে যে, গবেষণা পরিচালনার সময় গবেষকগণ অবগতক্রিমে সম্মতির বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান নিয়ে কাজ শুরু করেন নি। উক্ত তথ্য-উপাত্ত অবগতিক্রমে সম্মতির প্রশ্নে গবেষকগণ খুব একটা সচেতনও নন। অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি গবেষকদের সবল অসম্মতি এ বিষয়টিই ইঙ্গিত করে।

অবগতিক্রমে সম্মতির কারণে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সম্মতি হবে ঐচ্ছিক। ঐচ্ছিক সম্মতির (Voluntary Consent) অর্থ হলো কোনো প্রকার চাপ বা জোরজবরদখল করে অংশগ্রহণকারীর সম্মতি আদায় করা যাবে না। অংশগ্রহণকারীকে গবেষণার গোটা পরিস্থিতি বুঝিয়ে, এর ঝুঁকি ও উপকার সম্পর্কে অবহিত করে তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য

বলা হয়— হাসপাতালে রোগীর, আর গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর অধিকারের নিরাপত্তা প্রদানে সাহায্য করে থাকে অবগতিক্রমে সম্মতি। সম্মতি একাধারে অংশগ্রহণকারী ও রোগীর মর্যাদা, ও তাদের প্রতি কীভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়ে থাকে। যে গবেষণায় মানুষকে সাবজেক্ট হিসেবে নিতে হবে সেখানে অবগতিক্রমে সম্মতি হলো প্রাথমিক নৈতিক নীতি। এর ফলে গবেষণার অংশগ্রহণকারী বুঝতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট গবেষণার স্বরূপ কী, কিংবা মানুষ ও সমাজের জন্য তা কতোটা কাজে আসবে। এসব বিবেচনা সামনে রেখে একজন অংশগ্রহণকারী সজ্ঞানে ও ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মতি জানাতে পারে সে তাতে অংশগ্রহণ করবে কিনা।

ক. অংশগ্রহণকারীর জন্য
১. অবগতিক্রমে সম্মতি কী?
২. অবগতিক্রমে সম্মতির সাথে কারা যুক্ত?
৩. অবগতিক্রমে সম্মতিতে কারা সম্মতি দিতে পারে?
৪. অংশগ্রহণকারীর লাভ-ক্ষতি কী কী রয়েছে?

খ. প্রতিষ্ঠানের জন্য
১. আই.আর.বি অনুমোদন রয়েছে কিনা?
২. আন্তর্জাতিক রীতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?
৩. সদস্য অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ডিসিপ্লিন ও বিশেষজ্ঞতার মানদন্ড মানা হয়েছে কিনা?

গ. গবেষকদের জন্য:
১. অবগতিক্রমে সম্মতি কী? ও
২. অবগতিক্রমে সম্মতির উপাদানসমূহ কী কী?

অবগতিক্রমে সম্মতির মৌলিক উপাদান

গবেষণার ক্ষেত্রে অবগতিক্রমে সম্মতির উপাদানসমূহ কী হবে? এখানে অংশগ্রহণকারীকে গুরুত্ব দিতে হবে। এই গুরুত্বের মধ্যে যেসব তথ্য উপাত্ত বিবেচনায় রাখতে হবে তা হলো: গবেষণা-পরিকল্পনা, ঝুঁকি ও উপকার, অংশগ্রহণের জন্য বিকল্প কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা, গবেষণার মেয়াদকাল, সেখানে অংশগ্রহণকারীর অবস্থান কীরকম হবে তা জানাতে হবে। গবেষণা-সাবজেক্ট কি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করছে? নাকি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে? এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীকে স্পষ্ট তথ্য জানাতে হবে। ব্যক্তিগত তথ্য সমূহের গোপনীয়তার প্রশ্নে গবেষকের অবস্থান কী হবে তাও জানাতে হবে। গবেষণায় অংশগ্রহণের পূর্বে অংশগ্রহণকারীর পরিপূর্ণ তথ্য অধিকার থাকতে হবে। গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতিতে নুরেমবার্গ কোড রীতি অনুসরণ করতে হবে। নুরেমবার্গ কোড ঐচ্ছিক সম্মতির (Voluntary Consent) উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। উক্ত কোড অনুসারে, ঐচ্ছিক সম্মতি হলো: গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর পছন্দ নির্বাচন করার সামর্থ্য থাকতে হবে। এই সামর্থ্য ইঙ্গিত করে যে, অংশগ্রহণকারীকে কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে, প্রতারণার সাহায্যে, মিথ্যা ও বিভ্রান্ত তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে তাকে প্রভাবিত করা যাবে না। এমন কি ক্ষমতা প্রয়োগ ও জীবননাশের হুমকি দিয়ে সম্মতি

আদায় করা যাবে না। যে বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করা হচ্ছে সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীর পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। উক্ত জ্ঞানের আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তার স্পষ্ট বোধ ও উপলব্ধি থাকতে হবে। এসব শর্ত থাকার অর্থ হলো অংশগ্রহণকারীর সিদ্ধান্তটিকে সমৃদ্ধ করা।

সম্মতিপত্র কী ধরনের হবে?

উক্ত ফরমে যেসব বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে:
প্রথমত. ক. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?
খ. গবেষণাটি কেন করা হচ্ছে?
গ. কী ধরনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য উক্ত গবেষণার মাধ্যমে অর্জন করা যাবে?
ঘ. উক্ত গবেষণার ফলাফল মানবজাতির কী উপকারে আসতে পারে?
ঙ. জ্ঞানের বিকাশ, ঔষধ বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ গবেষণা কী ধরনের সাহায্য করতে সক্ষম?
চ. প্রটোকলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী?
ছ. অনুমোদন: গবেষণা শুরু করার জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে। অনুমোদনের জন্য গবেষণা প্রটোকল আইআরবিতে (IERB: Institutional Ethics Review Committee) উপস্থাপন করতে হবে। গবেষণা পর্ষদ (IERB) যদি প্রটোকলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হন তাহলে সেটাকে বাতিলও করে দিতে পারেন।
জ. গবেষণা কাঠামো (The study design): অবগতিক্রমে সম্মতিপত্রে অবশ্যই গবেষণার ডিজাইন সম্পর্কে তথ্য থাকতে হবে। এই তথ্যের ভিত্তিতে রোগী বা অংশগ্রহণকারী জেনে যাবেন গবেষণার ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে।
ঞ. ঝুঁকি ও উপকার: প্রায় সময়ই গবেষণা লব্ধ ফলাফল থেকে উপকার বা ঝুঁকি আসতে পারে। উক্ত গবেষণায় অংশগ্রহণের ফলে অংশগ্রহণকারী কী কী উপকার পেতে পারেন, অথবা কী ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে তা জানাতে হবে। দায়িত্বজ্ঞান ও আস্থার সঙ্গে গবেষক তার অংশগ্রহণকারীকে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি জানাবেন। গবেষক বা চিকিৎসক যেন ভয় মিশ্রিত ঢং-এ বিষয়টি উপস্থাপন না করেন। উপস্থাপনা হতে হবে একেবারেই নির্মোহ, সাদামাটা এবং কোনো প্রকার ভণিতা ব্যতিরেকে।
ট. গবেষণা বা চিকিৎসার সময়কাল: গবেষণা পরিচালনার পূর্বে অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই গবেষণার সময়কাল জানাতে হবে। গবেষণার সময়কালও অংশগ্রহণকারীকে জানাতে হবে। এতে করে অংশগ্রহণকারী জেনে যাবে কখন গবেষণা শুরু হবে, আর কখন তা শেষ হবে। এ তথ্য অংশগ্রহণকারীর পরিকল্পনা ও মানসিক প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে।
ঠ. ঐচ্ছিক ক্ষমতা (Voluntariness): একটি আদর্শিক বাস্তবতায় এটাই প্রত্যাশিত যে, একজন ব্যক্তির কোনো প্রস্তাব স্বাধীনভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার অধিকার রয়েছে। যে কোনো প্রস্তাবনা গ্রহণের সময় অবশ্যই ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে থাকতে হবে। কোনো প্রকার চাপ বা দমন থাকা যাবে না। একই ভাবে অংশগ্রহণকারী যদি কোনো পর্যায়ে এসে অস্বস্থিবোধ করেন তাহলে সেখান থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারবেন।
ড. ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা (Confidentiality of personal data): গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর নিকট থেকে ব্যক্তিগত অনেক তথ্য জানার প্রয়োজন হতে পারে। অনেক সময় গবেষণার সময়সীমা, অংশগ্রহণকারীর বয়স, লিঙ্গ, কিংবা ব্যক্তির একান্ত তথ্যাদি গোপন রাখতে হয়। এসব তথ্যাদি অন্য কারো সাথে শেয়ার করা যাবে না।

অবগতিক্রমে সম্মতির সীমাবদ্ধতা

অবগতিক্রমে সম্মতির একটি ইতিবাচক দিক হলো দু'পক্ষের মধ্যে সমতাভিত্তিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। এই সম্পর্কের লক্ষ্য হলো স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দু'পক্ষকে দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যের মধ্যে নিয়ে আসা। সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমরা আইনের বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করি। কিন্তু, আইনের প্রয়োগ অপেক্ষা ব্যক্তির নৈতিক বাধ্যবাধকতা ভালো সুফল আনতে পারে। এজন্য বলা হয়— সম্মতি নৈতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এই শর্ত এমন যে, আইন অপেক্ষা ব্যক্তির নৈতিক বোধ-বিবেচনা, জোর প্রয়োগ অপেক্ষা সদিচ্ছা ও স্বাধীনতা, চাপ প্রয়োগ অপেক্ষা স্ব-শাসন ও আস্থা (বিশ্বস্ততা) গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সর্বোপরি স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি হলো অবগতিক্রমে সম্মতির মূল বৈশিষ্ট্য। এখানে প্রশ্ন হতে পারে সম্মতিই কি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বশর্ত? প্রায়শই লক্ষ করা যায়— সম্মতি নেবার পরও কোনো একটি সিদ্ধান্ত অনৈতিক হতে পারে। লঙ্ঘিত হতে পারে গোপনীয়তা, লাভ ও ঝুঁকির মতো অন্যতম শর্তসমূহ। সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় দেখা যায়— সম্মতি নেবার পরও লব্ধ গবেষণা ফলাফল ব্যক্তি বা জাতিগোষ্ঠীর জন্য ক্ষতিকর ফলাফল বয়ে নিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে সত্তর দশকে প্রকাশিত কয়েকটি গবেষণার প্রসঙ্গ আনা যেতে পারে। জেনসেন (১৯৭২) ও আইসেন্ক (১৯৭১) তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল হলো: "কৃষ্ণাঙ্গদের বুদ্ধাঙ্ক শ্বেতাঙ্গদের অপেক্ষা স্থূল। বংশগত তারতম্যই এই স্থূলতার কারণ।" জাতিবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেবার নিমিত্তে সম্পন্ন এই গবেষণা পরবর্তী সময় যথেষ্ট আলোড়ণ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এটাও সত্য যে, জাতিগত পার্থক্য দেখিয়ে বুদ্ধি ক্ষমতার তারতম্য দেখানো একমাত্র যুক্তি নয়। কারণ যেসব কৃষ্ণাঙ্গদের গবেষণার একক বিবেচনা করা হয়েছে তাদের বুদ্ধিমত্তা বিকাশের জন্য ন্যুনতম সামাজিক, পরিবেশিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি পর্যাপ্ত ছিলো কি না তা সেখানে উল্লেখ ছিলো না। উক্ত গবেষণার বিরুদ্ধে নানামুখী সমালোচনা ও প্রতিবাদ উত্থাপিত হতে থাকে। যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক মাপকাঠির নিরিখে তাদের এই সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হয়। উক্ত দৃষ্টান্ত থেকে দাবি করতে চাইছি যে, সকল সময় গবেষক তাঁর লব্ধ গবেষণাকে মূখ্য করে তুললেই হয় না। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল কোনো জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে অতিশায়িত সিদ্ধান্ত কিনা, অন্যান্য সকল অপরিহার্য শর্তাদি এখানে বিবেচনা করা হয়েছে কিনা তাও বিবেচ্য বিষয়। এদিক থেকে অবগতিক্রমে সম্মতি যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে।

অবগতিক্রমে সম্মতির এতো সব অর্জনের পরও এর কিছু সীমাবদ্ধতাও দৃষ্টি এড়ায় না। চিকিৎসা-গবেষণার ক্ষেত্রে অবগতিক্রমে সম্মতির প্রয়োগের ফলে বেশ কিছু বিভ্রান্তির মুখোমুখি হতে হয়, এ বিভ্রান্তিকে অ্যাপেলবম ও লিডজ (১৯৮২) চিকিৎসাগত বিভ্রান্তি (Therapeutic Misconception) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গবেষণা-সাবজেক্ট বা অংশগ্রহণকারী হয়তো ভাবতে পারেন, গবেষক তার পরিপূর্ণ স্বার্থ সংরক্ষণ করবেন। রিসার্চ সাবজেক্টের এ প্রত্যাশার পেছনে বিদ্যমান রয়েছে গবেষকদের প্রদত্ত আশা প্রদান। সুতরাং, সম্মতির পেছনে রয়েছে বেশ কিছু মনস্তাত্ত্বিক দোটানা। এই দোটানার কারণে সম্মতি শেষ পর্যন্ত খুব একটা সঙ্গতির দাবি রাখে না। সম্মতি প্রদানের ক্ষেত্রে আরো কিছু সীমাবদ্ধতার কথা তারা উল্লেখ করেন:

ক. তৃতীয় বিশ্ব সাপেক্ষে গবেষণা ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় যেসব সংকট রয়েছে তাই সম্মতির ধারণাকে দুর্বল করে ফেলে। অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন জনগোষ্ঠী প্রায় সময়ই অর্থনৈতিক সুবিধা ও প্রলোভনের কারণে সম্মতি দিতে পারে। এভাবে সম্মতি পরিপূর্ণ স্ব-শাসনকে উপস্থাপন করে না।

বরং অর্থনৈতিক মাপকাঠি স্ব-শাসনকে নিয়ন্ত্রণ করে। বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ শেষতক সম্মতির নৈতিক চরিত্রটিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়।

খ. সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বাস্তবতাও সম্মতির সঙ্গে জড়িত। যেমন, বিশেষ কিছু ধর্মীয় বাস্তবতায় কোনো ব্যক্তি গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে অপরাগতা জানাতে পারে। এমনকী সে দাবি করতে পারে যে, প্রযুক্ত গবেষণা কিংবা চিকিৎসা ব্যবস্থা তার ধর্মীয় সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের পরিপন্থি। এরকম পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিক গবেষণা এর লক্ষ্যে উপনীত হতে নাও পারে।

গ. অধিকারবাদী পরিপ্রেক্ষিত থেকে তৃতীয় মন্তব্যটি করা যেতে পারে। অবগতিক্রমে সম্মতি সাধারণত ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি, তৃতীয় বিশ্বে অংশগ্রহণকারীর অধিকার ও স্বাধীনতা খুব একটা গুরুত্ব পায় না। গুরুত্ব না পাবার অর্থ হলো সম্মতির চূড়ান্ত অর্থটি তাৎপর্যহীন হয়ে যেতে পারে। এই তাৎপর্যহীন পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বে অবগতিক্রমে সম্মতি কতোটা প্রয়োগযোগ্য হবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবগতিক্রমে সম্মতির সঙ্গে আরো অনেক প্রাসঙ্গিক ইস্যু রয়েছে যাদেরকে বিশেষায়িত করে সুনির্দিষ্ট কৌশলের আওতায় আনার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু প্রায় সময়ই সেটা করা হয়ে ওঠে না। কসমেটিক সার্জারির উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। এখানেও বিশেষ ধরনের অবগতিক্রমে সম্মতির প্রয়োজন রয়েছে। তবে স্বাস্থ্যসেবার অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোনো ইস্যু অপেক্ষা কসমেটিকস ইস্যুটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। একারণে স্বাস্থ্যসেবার অন্যান্য খাত অপেক্ষা কসমেটিক্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অবগতিক্রমে সম্মতির স্বরূপই আলাদা। আবার গবেষণারও নানা ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন, সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির যে ধারা বা বাস্তবতা গ্রহণ করা হবে, প্রাণীবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে তা থেকে ভিন্নভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এই ভিন্নতা প্রাণ-প্রযুক্তির মতো চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। এর অর্থ হলো অবগতিক্রমে সম্মতি এক ও অভিন্ন স্বরূপে ভূমিকা রাখতে পারে না। এই ভিন্নতার ধারা অনেক সময়ই গবেষক বজায় রাখতে পারেন না। এই ব্যর্থতা কার্যত অবগতিক্রমে সম্মতিরই ব্যর্থতা। ধর্ম, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধগত ভিন্নতার কারণেও অবগতিক্রমে সম্মতির ধরনও পাল্টে যেতে পারে। যেমন, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক কারণে কোনো জনগোষ্ঠীর সদস্যগণ বিশেষ কিছু বিষয়ের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাতে অপারগ হতে পারেন। এ ভিন্নতা প্রমাণ করে যে, অবগতিক্রমে সম্মতি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে খুব একটা সহজ বিষয় নয়।

চিকিৎসা গবেষণার ক্ষেত্রে অবগতিক্রমে সম্মতির যথাযথ প্রয়োগ নিয়েও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। চিকিৎসা গবেষণার প্রভূত উন্নতি হবার ফলে ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা কৌশল বের হয়েছে। এতে কোনটি যথার্থ সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণ চিকিৎসকের জন্য দুরূহ হয়ে পড়ে। ধরা যাক, কোনো একটি রোগের চিকিৎসার জন্য ক, খ, গ নামে গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়েছে। ডাক্তার হয়তো ভাবছেন উক্ত রোগীর জন্য 'খ' কৌশলটি যথাযথ। কিন্তু, অন্যান্য মেডিকেলে গবেষকগণ 'ক' নামক কৌশল প্রয়োগ করে সফলতা পেয়েছেন। কোনটি যথোপযুক্ত কৌশল একজন রোগীর পক্ষে বোঝে ওঠা সম্ভব নয়। এরকম দ্বৈতাবস্থায় সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে চিকিৎসককে নৈতিক সংকটে পড়তে হয়। এই সংকট অবগতিক্রমে সম্মতির একটি দুর্বলতা হিসেবে উল্লেখ করা যায়। কারণ এতে ক্লায়েন্টের জন্য যথাযথ কৌশলটি কী তা বোঝানো খুবই মুস্কিল হয়ে যায়।

উপসংহার

গবেষণা, চিকিৎসা তথা অন্যান্য ক্ষেত্রে অবগতিক্রমে সম্মতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু। বিজ্ঞানী, গবেষক ও চিকিৎসক যেন তার সাবজেক্টের প্রতি নৈতিক আচরণ করেন সে প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে কতোগুলো নীতিমালার প্রস্তাব করে থাকে। অবগতিক্রমে সম্মতির জন্য নৈতিক নীতিমালা গবেষণায়, চিকিৎসায় ও বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকারীকে স্ব-শাসিত সত্তা হিসেবে বিবেচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। কীভাবে ন্যায়পরায়নতা, পরোপকারিতা ও শ্রদ্ধার নীতি বহাল রাখা যায় সে সম্পর্কে সজাগ করে দেয়। অবগতিক্রমে সম্মতিকে বাস্তবসম্মত ও বৈধ করার জন্য অবশ্যই অংশগ্রহণকারীকে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। যদি কোনো কারণে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলা করা হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় অংশগ্রহণকারীর অধিকার থেকে তাকে বিচ্যুত করা। এর অর্থ হবে অংশগ্রহণকারীর প্রতি অনৈতিক আচরণ করার সামিল। বাস্তবে বা অনুশীলনে অনেক সময় গবেষক ও অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। এধরনের সংকট হতে পারে ভাষাগত তারতম্যের কারণে, ধর্মীয় বিশ্বাসের অবস্থান থেকে, হতে পারে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন ও প্রত্যাশা থেকে। এসব সমস্যাদি অনেক সময় অংশগ্রহণকারী ও গবেষকের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়ার গুণগত চরিত্রটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এজন্য গবেষক, চিকিৎসক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীর প্রশ্নে খুবই মনোযোগী হতে হবে। এমনকি অবগতিক্রমে সম্মতি প্রসঙ্গে উপলব্ধিমূলক প্রতিক্রিয়া থাকতে হবে। অবগতিক্রমে সম্মতির সাথে সম্পর্কিত কাগজ-পত্রাদি, তথ্য-উপাত্তে উভয়ের যথাযথ স্বাক্ষর থাকতে হবে। গবেষক বা চিকিৎসককে নিশ্চিত করতে হবে যে, কোনো কারণে অংশগ্রহণকারীর উপলব্ধির কমতি নেই।

গোটা গবেষণা চলমান অবস্থায় অংশগ্রহণকারীর প্রতি অসদাচারণ, ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি তাও নিশ্চিত করতে হবে এজন্য যে, গোটা সম্মতি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীর স্বাধীনতা ও স্ব-শাসনকে গুরুত্ব দিয়ে করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত জনগোষ্ঠী অবগতিক্রমে সম্মতি বিষয়ে কতোটুকু জ্ঞান রয়েছে তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ৩০০ জন অংশগ্রহণকারী ও গবেষকের মধ্যে নির্ধারিত প্রশ্নের আলোকে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উক্ত সমীক্ষা থেকে লব্ধ ফলাফলকে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ বাস্তবতায় অধিকাংশ গবেষকই অবগতিক্রমে সম্মতিকে গুরুত্ব প্রদান করে না। অথচ গবেষণাকে নৈতিক ও দায়িত্বশীল করার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা খুবই অপরিহার্য।

তথ্য নির্দেশিকা

Appelbaum P, Roth L, Lidz C, 1982. The Therapeutic Misconception: Informed Consent in Psychiatric Research. *International Journal of Law and Psychiatry*, 5:319-329.

Beauchamp, T.L. and Childress, J.F. (1994) *Principles of Biomedical Ethics,* 4th ed. New York: Oxford University Press.

Bulger, R.E. 2002. Research with Human Beings. In Bulger, R.E., Heitman, I., & Reiser, J. (Ed.), *The Ethical Dimensions of the Biological and Health Sciences*, pp. 117-125, New York: Cambridge University Press.
Bentley JP, Thacker PG. (2004). The influence of risk and monetary payment on the research participation decision-making process. *Journal of Medical Ethics*,30: 293-298.

Brehaut JC, Lott A, Fergusson DA, Shojania KG, Kimmelman J, Saginur R. (2009). Can Patient Decision Aids help People Make Good Decisions about Participating in Clinical Trials? A Study Protocol. *Implementation Science*, 3:38.

Eysenck. H. J., 1971. *Race, Intelligence and Education*, London: Temple Smith.

Halpern et al. (2004). "Empirical Assessment of whether Moderate Payments are Undue or Unjust Inducements for Participation in Clinical Trials", *Archives of Internal Medicine*,164:801-803.

Newman E., E. Risch, and N. Kassam-Adams. 2006. "Ethical Issues in Trauma-related Research: A Review", *Journal of Empirical Research on Human Research Ethics*, 1(3):29-46.

Jensen, A.R., 1972, *Genetic and Education*, USA : Harper & Row, Publishers, Inc.

Jensen, A.R., 1973, *Educability and Group Differences,* New York: Harper and Row.

Ryan RE, Prictor MJ, McLaughlin KJ, Hill SJ. (2008). Audio-visual presentation of information for informed consent for participation in clinical trials. *Cochrane Database Systematic Reviews,* 23 (1).

Reich, W. T., 1996. 'Bioethics in the United States', in, *History of Bioethics: International Perspectives*, (eds.) Dell'oro, R., and Viafora, C., San Francisco: International Scholars Publications.

Singer E, Hippler HJ, Schwarz N. (1992). Confidentiality assurances in surveys: Reassurance or threat. *International Journal of Public Opinion Research*, 57: 465-482.

WMA, 2000. "Declaration of Helsinki", World Medical Association, http://www.wma.net/e/policy/b3.htm, accessed : 10 July, 2016.

Who, 1993. *International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human subjects*, Geneva : CIOMS (Council of International Organization of Medical Sciences) & WHO

[প্রবন্ধটি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের গবেষণা প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থে সম্পন্ন গবেষণার ফলাফলের অংশবিশেষ।]